ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা (পর্ব-২)

মার্মেডিউক পিকথল

প্রথম পর্বঃ [ইসলামী সংস্কৃতির মর্ম কথা]

ইসলাম ধর্মকে তার যথার্থ কর্মাংগন দৈনন্দিন জীবনে ঠাঁই দিয়েছে। কুরআনে আল্লাহ্‌র 'নূর' বা আলোর কথা বলা হয়েছে, আল্লাহ্‌র পথ-নির্দেশ অনুসরণকারীদের প্রত্যেকের কাছে তার অর্থ সুস্পষ্ট। কেননা, এ হচ্ছে এমনি এক নিত্যদিনকার আলো, যা আল্লাহ্‌র স্বতঃনিসৃত শুদ্ধ পূত জ্ঞান দ্বারা রূপান্তরিত, উদ্ভাসিত এবং মহিমান্বিত হয়। ধর্মর লক্ষ্য ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত কোন দীর্ঘ-বিলম্বিত সুদূর আশ্রয়ী বস্তু নয়; তা এখানে- এই প্রবহমান বর্তমানের মধ্যেই রয়েছে; রয়েছে আমাদের সহগামীদের সুকৃতি ও নিত্যদিনকার কর্মাংগনের মাঝে। মহানবী (সাঃ) যে সত্যের কথা বলেন, আরবের প্রতীকবাদীরা তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ হিসেবে তাঁকে কিছু অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শনের জন্যে পীড়াপীড়ি করতে থাকে। এই প্রতীকবাদীদের সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়ঃ

এবং তারা বলেঃ একি স্বভাব-বৈশিষ্ট্য আল্লাহ্‌র প্রেরিত একজন নবীর- যিনি (সাধারণ) খাদ্য গ্রহণ করেন এবং নগর ও বাজারের পথে পদচারণা করেন? কেন তাঁর সংগে সতর্ককারী হিসাবে একজন স্বর্গীয় দূত (ফেরেশ্‌তা) পাঠানো হয না? অথবা (কেন) তাঁকে ঐশ্বর্যপূর্ণ একটা ধনাগার দান করা হয় না? অথবা (কেন) তাঁর এমন একটা বেহেশ্‌ত নেই যা থেকে তিনি খাদ্য-সামগ্রী পেতে পারেন? দুষ্কৃতিকারীরা তাই বলেঃ তারা (বিশ্বসীরা) যার অনুসরণ করছে সে একজন সম্মোহনকারী (যাদুকর) ছাড়া আর কিছুই নয়।

আর আল্লাহ্‌ যে-ভাষায় দূষ্কৃতিকারীদের এই মনোভাবের জওয়াব দিয়েছেন তা থেকে অত্যন্ত সহজ ও সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় অলৌকিক ঘটনা আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবীর প্রতি স্বীকৃতির প্রমাণ বা নিদর্শন নয়। কেননা মানুষের বিচার-বুদ্ধি ও যুক্তিবাদী দৃষ্টিভংগির কাছেই নবীদের আবেদন জানাতে হবে- তাদের দুর্বল চেতনা বা কৌতুহল প্রবণতার কাছে নয়। আল-কুরআনে আল্লাহ্‌ ঘোষণা করেনঃ

আমরা তোমার পূর্বে এমন কোন নবী পাঠাইনি যারা খাদ্য গ্রহণ ব্যতিরেকে ছিল এবং নগর বাজারের পথে পদচারণা করে নি।

এর অর্থ হচ্ছে প্রাচীন কালের যে-সব নবীকে লোকে অতি-মানবিক সত্তা বলে মনে করত, তাঁরাও সাধারণ মানুষ ছিলেন এবং তাঁরা আল্লাহ্‌র নামে অন্যদের কাছে আবেদন জানাতেন।

ইসলামের শিক্ষার দৃষ্টিতে অলৌকিকতা ঐশী শক্তির এবং ধর্মের প্রাণবস্তুর প্রমাণ নিদর্শন বা বৈশিষ্ট্য নয়। প্রকৃতপক্ষে, অলৌকিক শক্তি প্রাকৃতিক আইনের বিধানকে খুব কমই লজ্ঞন করে থাকে। কেননা প্রাকৃতিক আইন মৌলিকভাবে ঐশী শক্তিসঞ্জাত এবং স্বয়ং আল্লাহ্‌র নিয়ন্ত্রণাধীন। অলৌকিকতা বা অলৌকিক শক্তি-বৈচিত্র্য হচ্ছে, লক্ষের পথে চলাকালে কোন বিশেষ স্তরে মানবিক অগ্রগতির- কিংবা বলা যায় মানুষের আত্মিক অগ্রগতির এক বিশেষ প্রকাশ-বৈশিষ্ট্যের নিদর্শন। আত্মিক অগ্রগতির এই স্তরে সাধারণ মানুষের কাছে অপ্রকাশিত নিয়ম-ধারা বা বিধানসমূহ দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনের সংগেও বহু অলৌকিক ঘটনা জড়িয়ে আছে। কিন্তু কোন মুসলমান এগুলোকে তাঁর নবুয়ত কিংবা তাঁর নবীসুলভ কর্মব্রতের প্রমাণ বা নিদর্শন বলে মনে করে না। আল্লাহ্‌র প্রত্যাদিষ্ট বাণী ও কর্মের লব্ধ সাফল্য- আল-কুরআন এবং মহানবীর প্রচার, আর এ দুইয়ের সামগ্রিক

ফলাফল- এদের নিজস্ব সাক্ষ্য বহন করছে। আর এগুলো সমস্ত অলৌকিকতার ঊর্ধ্বে।

তবে এটা সত্য যে, প্রত্যাদেশবাদী মুসলমানদের বেশীর ভাগই আজ অজ্ঞ, গোঁড়া ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন। তারা জনশ্রুতি, প্রবাদ, আজগুবী কাহিনী ও অসম্ভব বিশ্বাসকে ধর্ম-বিশ্বাসের সংগে যুক্ত করেছে। কিন্তু সেখানে মানুষের মন কঠোর বাস্তবধর্মিতা এবং সমাজের প্রচলিত অবস্থা ও প্রবহমান বর্তমানের আলোকে উদ্ভাসিত, সেখানে সব সময়ই এ ধরনের ভ্রান্ত বিশ্বাস সংশয়বাদিতা ও নাস্তিকতার অস্ত্রের হুমকীর সম্মুখীন। তবে এটাও ঠিক যে, এ-সব কুসংস্কার ও প্রবাদের এক বিরাট অংশই প্রাচীন কালের এক বিলুপ্ত বিজ্ঞানের প্রতিনিধিত্ব বহন করছে। ইসলামের অন্তর্বাণী ও যুগধর্মী মূল্যবোধ এই স্থবির অচলায়তনের বুকে আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা কামনা করে। কেননা, মুসলমানের মন পৃথিবীর সর্বক্ষেত্রে- সর্বপরিস্থিতিতেই স্বাধীন ও সংস্কারমুক্ত; অবশ্য এই মুক্তচিত্ততা তখনি সম্ভব, যখন সে তার দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক বিকাশ ও অগ্রগতির উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত কতগুলো বিধি-বিধান যথার্থভাবে পালন করে। তার যুগের বিজ্ঞান-সাধনা ও বৈজ্ঞানিক সৃষ্টির উদ্ভাবন এবং তার মন যা কিছুকে শ্রেয়তর মনে করে, সে-সব কিছু গ্রহণ ও বাস্তবায়ন তার কর্তব্যের অন্তর্ভূক্ত- এমন কি, যদিও তা মুসলমানদের মধ্যে বহু পূর্ব থেকে প্রচলিত কোন বিশ্বাস কিংবা তাদের বিশেষ কোন প্রবণতার পরিপন্থী হয়। কিন্তু এ তার ধর্ম-বিশ্বাসকে কখনো স্পর্শ করতে পারে না, যার প্রাণ-বাণী হচ্ছেঃ আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন নিয়ন্তা বা প্রভু নেই এবং মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্র প্রত্যাদিষ্ট নবী। এ হচ্ছে সেই জীবনবাদী ধর্ম- প্রখ্যাত জড়বাদী চিন্তানায়ক গীবন, যাকে একটি শাশ্বত সত্য ও একটি প্রয়োজনীয় উপাখ্যানের সমন্বয় বলে অভিহিত করেছেন। তবে ঐতিহাসিক পরিণতির পরিপ্রেক্ষিতে তিনি উপাখ্যান বা কাহিনীসুলভতার যৌক্তিকতাকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন।

ইসলামের বাস্তব ও কার্যকরী শিক্ষা এবং প্রবাদ ও জনশ্রুতির মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের জন্যে মুসরমানদের মধ্যে অধুনা এক ব্যাপক ও ক্রমবর্ধমান প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। এসব জনশ্রুতি ও প্রবাদকে পুরানো জীর্ণ পোশাকের মতই আজ ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে। মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাসে জুব্বার প্রভাবের অপ্রাধান্য দেখে খৃস্টানদের ধর্মীয় সংস্কারের বিভ্রান্ত সমালোচকগণই কেবল বিস্মিত হবেন। কেননা, তারা ধর্মবিশ্বাসের সাথে তার বাইরের আবরণকে এক করে দেখেন- যা মুসলমানরা কখনো করেনি।

আল-কুরআনে মানুষকে প্রাকৃতিক ঘটনা-বৈচিত্র, দিন-রাতের পর্যায়ক্রম, মাটি, বাতাস, আগুন ও পানির উপাদান, জন্ম-মৃত্যু, বিকাশ ও বিলুপ্তি (কিংবা উত্থান ও পতন) আর প্রাকৃতিক নিয়মও শৃঙ্খলার ধারা পর্যবেক্ষণ ও অনুধাবনের জন্যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রাকৃতিক নিয়ম শৃংখলা হচ্ছে এমন এক স্বতঃস্ফুর্ত ব্যবস্থা, যা মানুষের হাতে প্রণীত হয়নি এবং মানুষ যাকে এক চুল পরিমানও অবনত, স্থানচ্যুত কিংবা পরিবর্তন করতে পারে না। মানুষ যে এই জাগতিক বিশ্বের সার্বভৌম নিয়ন্তা নয়, এর প্রমাণ হিসেবেই তাকে এই প্রাকৃতিক রহস্যসমূহ পর্যবেক্ষণ ও অনুধাবনের জন্যে বলা হয়েছে। মানুষের মুক্ত চিন্তা, গবেষণা ও সাফল্যজনক প্রচেষ্টার পরিসীমা একটি সার্বভৌম ও স্বয়ং-সম্পূর্ণ সত্তার অধীন একটি 'আরোপিত শক্তি' ছাড়া আর কিছুই নয়। এই স্বয়ং সম্পূর্ণ সার্বভৌম সত্তা মহাবিশ্বের স্রষ্টা ও প্রতিপালক এবং জগতসমূহের নিয়ন্তা মহিমান্বিত আল্লাহ্। নিয়মগত ভাবেই মানুষ তার প্রাকৃতিক অবস্থার বিস্ময়কর রহস্য এবং তার চারপাশে যে শাশ্বত বিধান নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে, তা উপলব্ধি করতে পারে না। কেননা, এগুলো কখনো তাকে নিরাশ করে না। এক অসাধারণ সৃজনশীল শক্তির রহস্য চারপাশ থেকে তাকে ঘিরে রেখেছে- যে শক্তি নিস্ফল কিংবা ব্যর্থ হয় না; আর অলংঘনীয় একটি আইন ও নিয়ম-ধারার অধীন করে একটি বিশ্বে তাকে অভিষিক্ত করা হয়েছে। এবং এমন প্রত্যক্ষভাবে সে এ নিয়মের অধীন যে, এর বিধানসমূহ (বা সে প্রণয়ন করেনি) মান্য না করে সে একটি নিঃশ্বাস ফেলতে পারে না, একটি আঙ্গুল হেলাতে পারে না, একটি শব্দ উচ্চারণ করতে পারে না এবং এতটুকু কল্পনা বা চিন্তা পর্যন্ত করতে পারেনা। সাধারণভাবে মানুষ এই বিষয়গুলো নিয়ে খুব সামান্যই চিন্তা করে। কেননা, নিজেকে নিয়েই সে অনুক্ষণ ব্যস্ত থাকে এবং নিজের কর্মশক্তির সীমিত জগতে যে-কোন পোকা-মাকড়ের মতই স্বার্থের দ্বন্দ্বে সে নিজেকে আবদ্ধ রাখে। তার এই গণ্ডিবদ্ধ পরিসীমাকেই সে সবচেয়ে বড় মনে করে এবং শুধু তার বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনে সাহায্যের জন্যেই সে একজন ভাগ্যবিধাতার প্রয়োজন অনুভব করে। এই আত্মকেন্দ্রিকতার উপাসনা করতে যেয়ে সে সমগ্র সৃষ্টির প্রয়োজন এবং উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়।

এ-কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, একজন স্রষ্টা আর একটা উদ্দেশ্যের কথা স্বীকার করে নিলেই আমরা বিশেষ বা বিরাট কিছু আশা করতে পারি না। আমাদের অবশ্যই আল্লাহ্র ইচ্ছা এবং সৃষ্টির মূলে যে উদ্দেশ্য কাজ করছে, তার মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হবেঃ এবং একমাত্র তখনি আমরা সাফল্য আশা করতে পারিঃ

সত্য-সত্যই মানুষ বিদ্রোহাচরণ করে (অর্থাৎ সে তার সীমার বাইরে চলে যায়) এবং এজন্যেই সে নিজেকে স্বাধীন বা অমুখাপেক্ষী মনে করে। (হে শ্রোতৃবৃন্দ!) তোমাদের অবশ্যই তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

কয়েক বছর আগে স্কটল্যান্ডের জনৈক ধর্ম যাজকের একখানা বইয়ের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। বইটা তেমন আকর্ষণীয়

কিছু নয় এবং ইংরেজী ভাষাভাষী মানুষের কাছে তেমন কোন সাড়া জাগাতে পারেনি। বইটার নামকরণ করা হয়ঃ 'আধ্যাত্মিক জগতের প্রাকৃতিক আইন'। কেবরমাত্র নামের জন্যেই আমি বইটার উল্লেখ করছি। কেননা ইসলামের প্রত্যাদেশ-বাণীকে আরো ব্যাপকভাবে প্রয়োগ ও বিশ্লেষণ করা যেতে পারে এবং এই প্রশস্ত দৃষ্টিকোণ থেকে এভাবে অভিহিত করা যায়ঃ 'আধ্যাত্মিক জগত, সামাজিক জগত এবং রাজনৈতিক জগতের প্রাকৃতিক আইন।' যে প্রাকৃতিক আইন মানুষের দৈহিক অস্তিত্ব নিযন্ত্রণ করে, ইসলাম তার কাছেই আল্লাহ্‌র প্রকৃত প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্বের সাক্ষ্যদানের জন্যে তথ্য প্রামাণ্য নিদর্শনের আবেদন জানায়; এবং তারপরই প্রমাণ করে কিভাবে ঠিক একই আইন মানুষের আধ্যাত্মিক, সমবায়িক বা সামগ্রিক জীবনও নিয়ন্ত্রিত করে। সকল নবী ও সুফী-সাধকদের জীবনের সংগে সংশ্লিষ্ট সমস্ত অলৌকিক ঘটনাকে এত কম গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে যে, এগুলোর ওপর বিশ্বাস স্থাপন বাধ্যতামূলক বা অপরিহার্য নয়। ইসলামের দৃষ্টিতে যা কিছু বাধ্যতামূলক, তা হচ্ছে আল্লাহ্‌র সার্বজনীন সার্বভৌমত্ব এবং হযরত মুহাম্মদ (আল্লাহ্‌ তাঁর ওপর শান্তি বর্ষণ করুন)-এর নবুয়ত এবং আল্লাহ্‌র মানবিক দূত হিসেবে অন্যান্য নবীর উপর বিশ্বাস স্থাপন। আল-কুরআনের একটি অনুবাদ পড়ার পর ইসলামের এই স্বাভাবিক ও বাস্তবধর্মী বৈশিষ্ট্য দেখেই সর্বকালের শ্রেষ্ঠতম জার্মান কবি গ্যেটে বিস্ময়-বিহ্বল কণ্ঠে বলেছিলেনঃ এ যদি ইসলাম হয় তবে আমাদের মধ্যে প্রতিটি চিন্তাশীল ব্যক্তিই একজন মুসলমান।

গণতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র কিংবা ধনতন্ত্র- অথবা আধুনিক যুগে পরীক্ষিত অন্য কোন মতবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত না হয়ে সম্পূর্ণভাবে নীতি ও আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ইসলামী সংস্কৃতি আধুনিক চিন্তার ক্ষেত্রে অপাঙক্তের- এই অজুহাত তুলে আধুনিক বিশ্বের এক শ্রেণীর লোক- বিশেষ করে সবচেয়ে সচেতন একটি শ্রেণী ইসলামী সংস্কৃতি সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করবে। এবং কেউ একথাও যোগ করতে পারে যে, তাদের সকলেই একযোগে ইসলামী সংস্কৃতিকে ধর্মীয় আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়ে ওপরের যেকোন মতবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত দেখতে চাইবে। আরো স্পষ্ট করে বলা যায়ঃ তারা ধর্মীয় বা নৈতিক আদর্শ ছাড়া অন্য যে-কোন মতবাদের ওপর ইসলামী সংস্কৃতিকে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চাইবে এবং তাদের সমস্বরে এর প্রতি সমর্থন করতে দেখা যাবে।

ধর্মের পরোক্ষ আদর্শকে ইসলাম গ্রহণ করেনি এবং মূল্যবোধের গণ্ডিকে সীমিত করে দেয়নি। তাই কেবল উপাসনার সময় ধর্মকে স্মরণ করা হয় এবং অন্য সময়ে ভুলে যাওয়া হয়- ধর্ম সম্পর্কে এই ধরনের নিরাসক্তি এবং জীবন থেকে তাকে দূরে সরিয়ে রাখার মনোভাব ইসলামে ঠাঁই পায়নি। প্রকৃতপক্ষে, খাঁটি, কার্যকরী ও পূর্ণাংগ ধর্মীয় আদর্শবাদকেই ইসলাম স্বীকৃতি দেয় এবং সব সময়ে এই আদর্শের অনুসরণ করে। জনৈক প্রখ্যাত ইউরোপীয় রাজনীতিবিদ ধর্মীয় আদর্শবাদ সম্পর্কে এই কটাক্ষ করে বাহ্‌বা লাভ করেন যে, প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে সর্বশক্তিমানের কোন ভূমিকা নেই। সাম্প্রতিক ইতিহাসের পাঠকদের চোখে ইউরোপীয় রাজনীতির প্রধান যে ত্রুটিগুলো সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়বে, তার মধ্যে প্রধান হচ্ছেঃ তারা আল্লাহ্‌র কার্যক্রম তথা কোন অদৃষ্টপূর্ব ঘটনা, যা বাস্তব পরিকল্পনাসমূহকে ওলট-পালট করে দেয়া- তার প্রতি কোনরূপ গুরুত্ব আরোপ করে না। আল্লাহ্‌র পরিণামসূচক আইন এখানে কার্যকরী রয়েছে। ভালোর পরিণাম এখানো ভালো এবং মন্দের পরিণাম পরবর্তী যে-কোন অবস্থায়ই মন্দ। এ স্বাভাবিক পরিণাম সম্পর্কে যত লোকই চোখ বুঁজে থাকে না কেন, এ ঘটবেই। আমাদরে সময়ে যত অদৃষ্টপূর্ব ঘটনা ঘটেছে, তার মধ্যে দৃষ্টান্ত হিসেবে রুশ বিপ্লব ও তুরস্কের ওপর গ্রীক হামলার ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এ নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র পরিণামসূচক কাজ, যা মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে নিশ্চিত সাফল্যের সম্ভাবনাবাহী লোলুপ আকাংখা-প্রবণ পরিকল্পনাসমূহ এবং রাষ্ট্রনীতিবিদদের সুপরিকল্পিত চক্রান্তকে নস্যাত করে দিয়েছে।

আল্লাহ্‌র শাসন ব্যবস্থা বা খিলাফত সম্পর্কে যা বলা হয়েছে এবং আবার কিছুটা বাস্তবায়িত করতে ইসলাম সক্ষম হয়েছে, তার আলোকে বিচার করলে আমার কাছে মনে হয়, মধ্যযুগের সংগে আধুনিক বিশ্বের মোটেই কোন পার্থক্য নেই। এ মতের বিরুদ্ধবাদীগণ শুধুমাত্র ভূয়া প্রমাণপঞ্জিকে মূলধন করে তর্ক তুলবেন। কেননা, মধ্যযুগে ইউরোপে ধনতন্ত্রের যে আদর্শবাদ বিদ্যমান ছিল, তা আজগুবী প্রবাদ-কাহিনী, গীর্জার স্তোত্র ও আচার-অনুষ্ঠানের সংগে একীভূত হয়ে পড়েছিল এবং ধর্মকে তখন পংকিল পৃথিবী থেকে আত্মরক্ষার আশ্রয়স্থল বলে মনে করা হত। ইউরোপীয় ধর্মীয় আদর্শের এইসব ভূয়া ও বিভ্রান্তিকর প্রমাণপঞ্জি তুলে ধরে এসব তর্কবাগীশগণ স্বতঃসিদ্ধভাবে ধরে নেয় যে, সমস্ত ধর্মীয় আদর্শই অব্যস্তব এবং কেবল সংসার-বিমুখ সন্ন্যাসী বা ধর্মান্ধদের স্বপ্ন মাত্র। আধুনিক বিজ্ঞান অলৌকিকতাকে কক্ষচ্যুত করেছে এবং মানুষ তাদের এক মহান কর্তব্য হিসেবে এই পৃথিবীর সম্পদ ও ঐশ্বর্যের পূর্ণাংগ সদ্ব্যবহার এবং এর আওতায় তাদের অবস্থার উন্নয়ন সাধনের কথা চিন্তা করছে। এদের মধ্যে যারা মহৎ তারা তাদের প্রতিবেশী ও দেশবাসীর অবস্থার উান্নয়নকে বড় করে দেখছে এবং এর তুলনায় নিজেদের অবস্থার উন্নয়নের কথা কম ভাবছে।

এভাবে বাস্তব জীবন ও মানবিক প্রয়োজন থেকে বহুদূরে নির্বাসিত অলৌকিকতা-আশ্রয়ী এবং প্রাকৃতিকভাবে নৈরাশ্যবাদী একটি ধর্মবাদী আদর্শ আধুনিক জীবন-ব্যাবস্থার সংগে সংগতিবিহীন আর আধুনিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে স্বাভাবিকবাবেই অপাংক্তের হয়ে পড়েছে। আর সত্যিই এ পরিবর্তিত যুগপ্রেক্ষণায় এ জীবনবিমুখ আদর্শকে অচল এবং নব জীবন বিধানের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বলে মনে করা যেতে পারে। কেননা, এ আদর্শবাদ এই পৃথিবীকে শযতানের রাজ্য বলে মনে করে এবং মুক্তিসন্ধানী মানুষকে এ

পৃথিবীর পরিসীমা হতে পলায়নের নির্দেশ দেয়। এ ধরনের ধর্মীয় আদর্শবাদ কখনো স্বাভাবিক ও বাস্তব-নির্ভর হতে পারে না; এবং প্রকৃত পক্ষে এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। আধুনিক জীবনের আত্মঘাতী স্বার্থ-সর্বস্বতার প্রতিরোধের জন্যে একটি বাস্তবধর্মী জীবনাদর্শের আজ অনিবার্য প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এ হচ্ছে এমন একটি আদর্শ, যার ভিত্তি বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া কিংবা মানুসের চিন্তার ব্যাপ্তির ফলে বসে যেতে পারে না। কেননা, বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনা ও মানুষের চিন্তার ফলাফল প্রকৃতির মধ্যে অন্তর্নিহিত রয়েছে; আর এ আদর্শও প্রকৃতিধর্মী। বিজ্ঞানের প্রগতিমুখী প্রচেষ্টা যত বেশী এবং ব্যাপকভাবে প্রাকৃতিক জগতের রহস্য উদ্‌ঘাটন করবে, ততই আরো অধিকতর কীর্তিত হবে খাঁটি মুসলমানের কাছে আল্লাহ্‌র মহিমা, তাঁর বিধান ও সার্বভৌমত্ব।

যে পর্যন্ত প্রাকৃতিক আইনসমুহ দৃঢ়সংবদ্ধ থাকবে এবং ভাল কিংবা মন্দের পরিণতি কোন বিশেষ মানুষ ও জাতির কার্যাবলীর অনুগমন করবে, সে পর্যন্ত মানুষের জীবনে তার নিজস্ব ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যের চাইতে বৃহত্তর একটি ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যের প্রয়োজন অবশ্যই অনুভূত হবে এবং মানুষ তার নিজের রায় ও বিচার-বুদ্ধির চাইতেও উচ্চতর বিচার-বুদ্ধির প্রত্যাশা করবে। আর যে পর্যন্ত বৃহত্তর ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যের নিকট মানুষের আত্মসমর্পণের প্রয়োজন অনুভূত হবে, সে পর্যন্ত মানুষ সাফল্য লাভ করবে। অর্থাৎ মানুষকে সাফল্য লাভ করতে হলে বৃহত্তর ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যের নিকট তাকে আত্মসমর্পণ করতে হবে। আর আল-কুরআনের শিক্ষার দৃষ্টিতে এই বৃহত্তর ইচ্ছা-উদ্দেশ্যের নিকট আত্মসমর্পণ হচ্ছে ইসলাম।

সমাজতন্ত্র, ফ্যাসিবাদ, শ্রমিকতন্ত্র ও বলশেবিকবাদের বিকল্প হিসেবে ইসলাম একটি পূর্ণাংগ রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক জীবন-ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি দান করে। পক্ষান্তরে, অন্য সব মতবাদ বিকল্প হিসেবে এমন একটি ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি দান করে বা নিশ্চিতভাবে অনিবার্য ধ্বংসের হুমকীর সম্মুখীন- অর্থাৎ অনিবার্য ধ্বংসই যার স্বাভাবিক পরিণতি। এ-সব অন্তঃসারশূন্য ঠুনকো মতবাদগুলোর ওপর ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার এক বিরাট প্রাধান্য রয়েছে এবং অপরিসীম সাফল্যের সংগেই এই জীবন-ব্যবস্থার অনুশীলন হয়েছে। আর সাফল্য যত বিরাট হবে, তার অনুশীলন এবং বাস্তবায়নও তত পূর্ণাংগ হবে। প্রতিটি মুসলমান বিশ্বাস করে যে, পৃথিবীর সকল জাতি পারিভাষিক অর্থে মুসলমান বা অমুসলমান যে-কোন নামেই হোক না কেন, ইসলামের নির্যাস বা মর্মবাণীকে গ্রহণ করবে। কেননা, ইসলামের আইন হচ্ছে প্রাকৃতিক (কিংবা ঐশী) বা স্বাভাবিক আইন, যা মানুষের অগ্রগতিকে পরিচালিত করে। মানুষ অন্য সব পথের সন্ধান করে শেষ পর্যন্ত বেদনাদায়ক ব্যর্থতা বরণ করতে করতে অবশ্যই একদিন এই প্রাকৃতিক জীবন-বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করবে এবং তার আকাংখিত পথের সন্ধান খুঁজে পাবে। আমরা আজ যেখানে শ্রেণীতে শ্রেণীতে এবং জাতিতে জাতিতে বিভেদ দেখিছি, আর যেখানে কোন স্থিতিশীলতা লক্ষ্য করছি না, ইসলাম সেখানে শান্তি ও স্থিতিশীলতার প্রতিশ্রুতি দান করে। শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের স্বীকৃতি এবং আল্লাহ্‌র প্রেরিত একজন বাণীবাহকের প্রত্যাদেশ-নির্ভর মতবাদের দাবীর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বলে এমন একটি জীবন-ব্যবস্থার ভাল-মন্দ এবং গুণাগুণ বিচার করতেও যদি কেউ অস্বীকার করে, তবে তার পক্ষে এটাকে নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই বলা যেতে পারে না। এবং এটা হবে নাস্তিকতাসুলভ গোঁড়ামির এক চরম নামান্তর মাত্র।

এ-কথাও সত্য যে, একমাত্র ধর্মীয় আদর্শভিত্তিক বলেই মানব সংস্কৃতির ইসলামী ব্যবস্থাকে অবজ্ঞার চোখে দেখা হচ্ছে না; প্রকৃতপক্ষে, আজকের পৃতিবীতে এবং পেছনে ফেলে আসা দিনে- বহু পেছনে ফেলে আসা দিনে- মুসলমানদের অবস্থা, কার্যকলাপ ও আচার -আচরণই এ অবজ্ঞার পেছনে কারণ যুগিয়েছে। মধ্যযুগে খৃস্টান জগত যাজক-অনুশাসনের দাসত্বের নিগড়ে বন্দী ছিল বলে ইসলাম সম্পর্কে কোনরূপ ধারনায় আসার সুযোগ পায়নি। আজকের মত সে সময়েও এই ধর্মান্ধ যাজক-শ্রেণী মহানবী হযরত মুহাম্মদকে (আল্লাহ্ তাঁর ওপর শান্তি বর্ষণ করুন) ভূয়া নবী বলে প্রচার করতে এবং তাঁর অনুসৃত ধর্মে যে মানব-জাতির জন্যে কোন কিছু ভাল ও কল্যাণকর থাকতে পারে, সে-কথা চিন্তা করার সুযোগ পর্যন্ত কাউকে (খৃস্টান ধর্মাবলম্বী) দিত না। তারপর উভয় ধর্মানুসারীদের মধ্যে সুদীর্ঘ যুদ্ধের ঐতিহ্য এক স্থায়ী বিদ্বেষ ও অসহিষ্ণুতার মধ্য দিয়ে বর্তমানকাল পর্যন্ত এ-ক্ষেত্রে এক বিরাট বাধার প্রাচীর সৃষ্টি করে। আজকে এ প্রাচীর কার্যতঃ অপসৃত হলেও বিশ্বে মুসলমানদের অবস্থা এমন নয় যে, তারা বাইরের লোকদের মনে ধারণার সৃস্টি করতে পারে যে, ঠিক এমনি মানুষরাই মানবিক অগ্রগতির পথের রহস্য জানে। আজ মুসলমানদের আচার-আচরণ ও অবস্থা ইসলামের পক্ষে অত্যন্ত খারাপ দৃষ্টান্ত। এ অবস্থা দেখে যদি কেউ তাদের মুখ ফেরায় এবং মুসলমানদের অধোগামিতার জন্যে ইসলামের ওপর দোষারোপ করার কথা চিন্তা করে, তবে তাতে অবাক হওয়ার কিছুই নেই। কথা হচ্ছে এই যে, এ জন্যে ইসলামকে দায়ী করার যায় না। এ প্রসংগে এ-কথা বলা যেতে পারে যে, খৃস্টান-জগতের বর্তমান বস্তুগত অগ্রগতির জন্যে খৃস্টান যাজক সমাজের প্রচেষ্টা অনেকখানি প্রশংসাহ। খৃস্টান ধর্মে একটি যাজকতন্ত্র রয়েছে এবং এতে চিন্তার স্বাধীনতার কোন স্বীকৃতি নেই। যে-সব শতাব্দীতে খৃস্টান গীর্জা বা যাজকতন্ত্র সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ছিল আজ সে-সব শতাব্দীকে অন্ধকার যুগ বলে অভিহিত করা হয়। ইসলামে কোন পৌরোহিত্যবাদ বা মোল্লাতন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল না এবং এতে আগা-গোড়া চিন্তার স্বাধীনতার স্বীকৃতি ছিল। যে যুগগুলোতে ইসলাম এর পূর্ণাংগ ও বিশুদ্ধ রূপ বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিদ্যমান ছিল, সে যুগগুলো বিশেষভাবে সুস্পষ্ট এবং ভাস্বর আলোকে বিদ্যমান। খাঁটি ইসলাম থেকে বিচ্যুতিই মুসলমানদের পতন ডেকে আনে। যাজকতন্ত্রের অনুরূপ এক রকমের পৌরোহিত্যবাদ বা মোল্লাতন্ত্রের প্রতি তাদের স্বীকৃতি কিংবা আল-কোরানের ভাষায় বলা যায়, আল্লাহ ব্যতীত অন্যদেরকে

তাদের প্রভু হিসেবে গ্রহণ পাণ্ডিত্যসুলভ বাক-বিতণ্ডার প্রতি তাদের আসক্তি, ধর্মীয় কর্তব্য হিসেবে যে কোন স্থান থেকে জ্ঞান আহরণের উপদেশের প্রতি তাদের উপেক্ষা দর্শন, মুক্ত চিন্তার প্রতি তাদের অস্বীকৃতি এবং বিচার বুদ্ধি যুক্তিবাদিতার প্রতি অনাস্থা তাদের পতনের প্রধান কারণ-সমূহের অন্যতম।

তাদের ইতিহাসের কোন এক পর্যায়ে তারা তাদের নির্দেশিত জীবন ব্যবস্থার একটি অংশের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন শুরু করে এবং শরীয়তের অধিকাংশকে বাতিল করে দেয়, যাতে আল্লাহর সৃষ্টি-কৌশল অনুধাবন ও উপলব্ধির উদ্দেশ্যে তাদের জ্ঞান শিক্ষার অনুশীলনের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এবং ঠিক সে সময়েই পাশ্চাত্যের খৃস্টানগণ মুসলমানদের পরিত্যক্ত শরীয়তের এই অংশটির মর্মবাণীর অনুগমন শুরু করে- আর তাদের যাজকশ্রেণীর সব-রকমের অভিসম্পাত সত্ত্বেও তারা অসাধারণ সাফল্য লাভ করে। পৌরোহিত্যবাদ মানবিক অগ্রগতির দুশমন বলেই ইসলামে এর অস্তিত্ব স্বীকার হয়নি। আর মানবিক অগ্রগতির দুশমন হিসেবে এ খাঁটি ধর্মেরও পরিপন্থি। মানবতার অগ্রগতি ও মুক্তিসাধনাকেই আল-কুরআনে খাঁটি ধর্মের লক্ষ্য হিসেবে বিধৃত হয়েছে- মানবতার বন্ধ্যাত্ব বা দাসত্ব নয়। বিশ্বের সর্বত্র মুসলমানরা আজ এ সম্পর্কে সজাগ হয়ে উঠেছে। তারা বুঝতে পারছে, তাদের অবমাননা ও হীনমন্যতার জন্যে তারা নিজেরাই দায়ী- কেননা এ তাদেরই কৃতকর্মের ফল। তারা আরো বুঝতে পারছে, একমাত্র ইসলামে প্রত্যাবর্তন করেই তারা তাদের গৌরবময় হৃত মর্যাদা পুনরুদ্ধার করতে পারে।

আপনারা ভাবতে পারেন যে, আমি আমার নির্ধারিত বক্তব্য বিষয় সংস্কৃতি থেকে সরে এসে ধর্মীয় আলোচনায় ব্যাপৃত হয়েছি। প্রকৃতপক্ষে ইসলামী সংস্কৃতি ধর্মের সংগে এত নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত আর আল্লাহর বিশ্বজনীন সার্বভৌমত্বের ধারণার সংগে এমনভাবে সংমিশ্রিত যে, প্রথেমেই কার্যকারণ ও প্রসংগ নির্দেশ ছাড়া বিষয়টিকে যথার্থভাবে তুলে ধরা আমার পক্ষে সম্ভব হত না। উত্থানে হোক আর পতনে হোক, - বিজ্ঞান, শিল্প, কিংবা সমাজ কল্যাণের যে-কোন পরিসর এবং অংগনেই হোক না কেন, সর্বত্র, সবখানে আর সব সময় ইসলামী সংস্কৃতির এই ধর্মীয় অনুপ্রেরণা এবং এই বিশ্বজনীন ও পূর্ণাং ধর্মীয় জীবন-ব্যবস্থার এক ব্যাপ্তিশীল আদর্শ রয়েছে। এ কথা সত্য যে, এর বিভিন্ন রূপ, সৃষ্টি ও প্রকাশের মধ্যে এমন কিছু আছে, যা সাধারণ ধর্মীয় অংগন থেকে অনেক দূরে। এই দৃষ্টিভংগিই আন্তর্জাতিকতার ভাব-রসে সম্পৃক্ত ইসলামী জাতীয়তাবাদের জন্ম দিয়েছে। কেননা, আল্লাহর বিশ্বজনীন সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি তার উদ্দেশ্যের পরিপূরক বিশ্বজনীন মানবিক ভ্রাতৃত্বের স্বীকৃতিই ঘোষণা করে।

(অনুবাদঃ সানাউল্লাহ্ নূরী)

সূত্রঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত "ইসলামী সংস্কৃতির রূপরেখা" গ্রন্থ।

মার্মেডিউক পিকথল